বুধবারের চিঠি

- মুসাররাত জাহান শ্বেতা

খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির পানির ছাট এসে আমার ঘর ভিজিয়ে দিয়েছে। কাল রোজকার চেয়ে একটু বেশী রাত জেগে ছিলাম। আজ একটা রিপোর্ট জমা দিতে হবে। রাত জেগে রিপোর্ট তৈরী করছিলাম, কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি। বৃষ্টির আভাস পেয়েও জানালা বন্ধ করতে কেমন যেন আলসেমি লাগছিল। অবশ্য জানালা দিয়ে যতখুশি বৃষ্টির পানি এসে ঘর ভিজিয়ে দিলে আমার মোটেও খারাপ লাগেনা। ভেজা ফ্লোরে শুধু একটু সাবধানে হাটলেই হল। বৃষ্টি পড়ার শব্দেই হয়তো ঘুম ভেঙে গেছে, নয়তো এতো ভোরে ঘুম ভাঙার কথা নয়। বাইরে তখনো অন্ধকার । আকাশে গাঢ় মেঘ বলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না বেলা কতটুকু হয়েছে। কিন্তু বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে কাক ডাকার শব্দ শুনে তড়িঘড়ি করে বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। দেরি করা যাবেনা। আট্টার ক্লাসেই একটা ক্লাস টেস্ট আছে।

মেঘলা দিনগুলোতে আমাকে প্রচন্ড আলসেমিতে পেয়ে বসে। বাসা থেকে বের হতে ইচ্ছা করে না। সব মেঘলা দিন গুলোই যদি ছুটির দিন হতো, কাঁথা গায়ে দিয়ে আয়েস করে ঘুমিয়ে কাটানো যেত! কিন্তু আজ আলসেমি করার উপায় নেই। রাত জেগে ক্লাস টেস্টের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। না গেলেই নয়। তাছাড়া রিপোর্টটাও শেষ করা হয়নি, দুপুরের আগে কোন এক সময় শেষ করে জমা দিতে হবে।

প্রচন্ড অনিচ্ছা সত্বেও ক্লাসে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি। মনকে শান্তনা দিলাম এই ভেবে যে, আজ বুধবার, রোজকার মত আট্টা-পাঁচটা ক্লাস নেই আজ, দুপুরের পরেই ছুটি। তাছাড়া এই দিন মার আর আমার রুটিন প্রায় একই বলে মাও আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। জগন্নাথ কলেজে যাবার পথে মা আমাকে বুয়েট ক্যাম্পাসে নামিয়ে দেন, আবার ফেরার সময় তুলে নেন আমাকে।

আট্টা বাজার একটু আগে ক্যাম্পাসে পৌঁছলাম। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। ক্যাম্পাসের গাছ গুলো বৃষ্টিতে ভিজে গাঢ় সবুজ হয়ে আছে। হলের ছাত্রছাত্রীরা প্রায় ছুটতে ছুটতে ক্লাসে আসছে। আমাকে ই.এম.ই. বিল্ডিংয়ের সামনে নামিয়ে দিতে দিতে মা মনে করিয়ে দিলেন “আজ যেন বৃষ্টিতে ভিজবে না, সামনে ফাইনাল পরিক্ষা আসছে।” মা জানেন সুযোগ পেলেই আমি বৃষ্টিতে ভিজতে ভীষন ভালবাসি।

মাকে বিদায় জানিয়ে আমিও ক্লাসের দিকে যাচ্ছি। কিন্তু ক্লাসে যেতে মন কিছুতে সায় দিচ্ছে না। সদ্যস্নাত পরিপাটি এই মেঘলা সকালে রোজকার মত ক্লাসে বন্দি হয়ে থাকার কোন মানেই হয়না । সামান্য একটা ক্লাস টেস্ট না দিলে এই সৌরজগতের কারোই তেমন কোন ক্ষতি হয়ে যাবে না। তাছাড়া একদিন ক্লাস ‘বাং’ মারলে কেউ পানিতে পড়ে যায় না। না হয় পরের ক্লাসে পড়া বুঝতে না পেরে স্যারের দিকে বোকার মত শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হবে। তা যা হয় হবে, আমার টার্গেটতো আর ক্লাসে প্রথম, দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় হওয়া নয়, ফার্স্টক্লাস পেলেই হলো। মিছিমিছি জীবনটাকে এত হয়রানি করে কি লাভ? ক্লাসে না যেয়ে আমি হেটে হেটে লাইব্রেরীর দিকে রওনা করলাম। ক্লাস বাদ দেওয়ার ফলে রিপোর্ট লেখার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া গেল। লাইব্রেরীতে বসে রিপোর্টের বাকি অংশ টুকু শেষ করার চেষ্টা করছি। হঠাৎ জানালা দিয়ে বাইরে চোখ পড়লো। তাকিয়ে দেখি ক্যাম্পাসের কদমের গাছ গুলো পূর্নপ্রস্ফুটিত ফুলে ভরে আছে। কি আশ্চর্য! প্রতিদিন সকাল থেকে

সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ক্যাম্পাসে কাটাই, এই বিল্ডিং থেকে ঐ বিল্ডিংয়ে যাই। অথচ কদমের ফুল গুলো এমন কি কদমের গাছ গুলোও কখনো চোখে পড়েনি আমার। ঠিক যেমন মাথার উপরের বিশাল আকাশটা প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা প্রতি মুহুর্তে আপন মনে নতুন নতুন ঢংয়ে সাজে, কখনো পরিস্কার নীল রংয়ে, আবার কখনো নীল আকাশে সাদা মেঘের বিচিত্র সাজসজ্জা, সূর্যোদয়ের সময় লাল সোনালী আলোর জাকজমক আয়োজন, কখনো সন্ধ্যায় নক্ষত্র বিথীর গহনায় সেজে থাকা আকাশটাকে আমরা কেইবা কখন মনযোগ দিয়ে দেখি। কদমফুলগুলোও যেন আপনমনে ফুটে আছে, কেউ তাদের এই সাজসজ্জা দেখলো কি দেখলো না তাতে তাদের তেমন ভ্রুক্ষেপ নেই। স্বর্ণচাপা গাছের সারিগুলোতেও গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী ফুলে ছেয়ে গেছে। বৃষ্টির পানিতে ভেজার ফলে ফুলগুলোর মিষ্টিগন্ধ পুরো ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়েছে। অসমাপ্ত রিপোর্টটাকে ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলাম। জমা দিতে হবে সেই দুপুরের ক্লাসে। মাঝের এই সময় টুকুতে একটু কার্জন হল থেকে বেড়িয়ে আসা যায়। কার্জন হলে আমার দু’একজন বন্ধু আছে, অনেকদিন পর তাদের সাথে দেখা করতে নিশ্চয় খারাপ লাগবেনা! তারা মাঝেমধ্যেই অভিযোগ করে যে আমি সহসা তাদের সাথে দেখা করতে কার্জন হল যাইনা।

লাইব্রেরী থেকে বের হয়ে একটু হাটতেই একটা খালি রিক্সা পাওয়া গেল। ক্লাসে বন্দী আমার বন্ধুদের জন্য একটু করুনা হল। ক্লাসে উপস্থিত না থেকেও আমি দিব্য দৃষ্টিতে ক্লাসের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি। ক্লাসটেস্ট শেষে স্যার বোর্ডে একটা অংক দিয়েছেন এক্সট্রা ক্রেডিটের জন্য। নিজেকে খুব স্বাধীন মনে হচ্ছে এখন। এমারসনের লেখা আমার প্রিয় দু'টো লাইন মনে মনে আওড়াচ্ছিলাম। "I’m the owner of the sphere, of the solar year and of the seven stars.” মনে মনে ভাবলাম - আজ এই মুহুর্তে আমি নিজেই ”the owner of the solar year!” এই আমি আর আমার মাথার উপরের বিশাল আকাশ ছাড়া অন্য কোন তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই।

রিক্সাওয়ালা র্কাজন হল যেতে রাজি হল। ভেজা প্লাস্টিকের পর্দাটার দুইপ্রান্ত আমার দুই হাতে ধরিয়ে দিয়ে সে নিবিষ্ট মনে রিক্সা চালিয়ে র্কাজন হলের দিকে যাচ্ছে। সামনে আরেকটা রিক্সায় মনে হল একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা যাচ্ছে। মেয়েটির মাথায় বেলীফুলের মালা। রিক্সার পেছনের পর্দাটা মাঝে মাঝে উড়লে, ফাঁকা জায়গা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছেলেটি মেয়েটির কাঁধে হাত দিয়ে রেখেছে। নিজের অজান্তেই ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম তারপর চোখ সরিয়ে নিলাম অন্যত্র।

দোয়েল চত্তরের কাছাকাছি যেতে আমার মন বদলে গেল। কার্জন হল আমার খুব প্রিয় জায়গা। অথচ কাছাকাছি এসে কার্জন হলে আর নামতে ইচ্ছা করছে না। জানিনা কেন, তবে কোন বিচিত্র কারনে খুব ভাললাগার জায়গা গুলোতে আমার খুব একটা যেতে ইচ্ছা করেনা। ঠিক যেমন, আমার পছন্দের মানুষদের কাছ থেকেও দূরে থাকতে আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করি। বারবার কাছ থেকে দেখে দেখে যদি ভাল লাগাটা কমে যায় হয়তো সেই ভয়েই। বরং বাস্তবে কাছ থেকে প্রিয় জায়গাগুলোকে দেখার চেয়ে কিংবা প্রিয় মানুষের সাথে মুখোমুখি বসে কথা বলার চেয়ে কল্পনায় সে সব জায়গায় বেড়ানো কিংবা কথা বলা অনেক নিরাপদ। কল্পনার রং-এ অসুন্দর দিকগুলোকে অনায়াসে মনের মত সুন্দর করে সাজিয়ে নেয়া যায়।

রিক্সাওয়ালাকে বললাম যে আমি এখন আর কার্জন হলে যেতে চাইনা বরং তার যদি অসুবিধা না হয় তাহলে যেন আমাকে শাহবাগের মোড়ে নামিয়ে দেয়। অনেকদিন ভেবেছি জাতীয় যাদুঘরটা ঘুরে দেখবো। রিক্সাওয়ালা ঘাড় ঘুড়িয়ে আমার দিকে বিরক্তির সাথে তাকালো।

রিক্সা এটোমিক এনার্জি ভবনের সামনে দিয়ে পার হওয়ার সময় দেখি ভবনের সামনে কতগুলো বড় বড় ক্যাকটাস আর ইয়ক্কার গাছে সাদা সাদা ফুল ফুটেছে। এই পথে আমি প্রায়ই যাওয়া আসা করি অথচ এসবের

কোন কিছুই কখনো আমার চোখে পড়ে না। রিক্সাওয়ালা কিছুটা বিরক্তির সাথেই শাহবাগের মোড়ে ফুলের দোকানগুলোর সামনে আমাকে নামিয়ে দিল। ফুলের দোকানী একটা কাঁচের বাক্সে তাজা বেলী ফুলের কতগুলো মালা সাজাচ্ছে। মালাগুলো দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে কিছুক্ষন আগেই বাগান থেকে ফুলগুলো তোলা হয়েছে। কিছু কিছু মালার কলি গুলো তখনো ফোটেনি। বেছে বেছে না-ফোটা কলির কয়েকটা বেলীফুলের মালা কিনে দোকান থেকে বের হয়ে এলাম। দোকানের বাইরে ছোট্ট একটা টোকাই খালিপায়ে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কদমফুল হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে । আমাকে দেখে হয়তো ভেবেছে আমি কদমফুল কেনার জন্য একজন যথার্থ ক্রেতা। আমার দিকে দৌড়ে এসে অনেকটা জোর করেই কদমফুলগুলে আমার হাতে দিয়ে বলল "ফুল কিনবেন আপা?"

হাত ভর্তি কদমফুল নিয়ে রাস্তাপার হয়ে যাদুঘরের দিকে যাচ্ছি। কারো মনযোগ আকর্ষন আমার উদ্দেশ্য নয়। অন্ততঃ মনযোগ আকর্ষনের জন্য হাতে ফুল নিয়ে ঘুরে বেড়ানোটা কোন ভাল আইডিয়া নয় নিশ্চয়ই। বেলীফুলের মালাগুলোকে অন্ততঃ ব্যাগে রেখে দেওয়া দরকার। ফুল রাখার জন্য ব্যাগটা খুলতেই চোখে পড়লো অসমাপ্ত রিপোর্টটা। ব্যাকপ্যাকের অনেকখানি জায়গা দখল করে আছে শুধু শুধু। রিপোর্টটা বের করে নেয়াতে বেলীফুলের মালাগুলোর জন্য জায়গা হয়ে গেল। কদমফুলওয়ালা টোকাই ছেলেটা তখনও রাস্তায় জমে থাকা পানি ছিটিয়ে খেলা করছে। আমি রিপোর্টের কাগজগুলো দিয়ে দু'একটা নৌকো বানিয়ে রাস্তায় জমে থাকা পানিতে ভাসিয়ে দিলাম এদিক ওদিক তাকিয়ে। শেষ ক্লাশে রিপোর্টটা জমা দেয়ার যে পরিকল্পনা ছিল, সেটাও ভেসে গেল নৌকো গুলোর সাথে। সামান্য একটা রিপোর্ট জমা দেওয়া সপ্তর্ষিমন্ডলের মালিকিনের জন্য খুবই তুচ্ছ একটা ঘটনা।

এমন নয় যে আমি খুব অস্থির চিত্তের মানুষ কিন্তু আজ বুধবার বলে কথা। বুধবারের দিনগুলোতে আমি ভীষণ এলোমেলো হয়ে যাই। এইদিন আমার মনের উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রন থাকেনা। মনটাই ইচ্ছে মত আমাকে নিয়ন্ত্রন করে। রোজকার মত রুটিন মেনে কাজ করতে মোটেই ইচ্ছে করেনা। কারন বুধবার আমার জন্য একটি বিশেষ দিন, প্রতি বুধবার বিশেষ একজনের কাছ থেকে আমার চিঠি আসে। নির্জন দুপুরে বাড়ীর সামনের স্বর্ণঝরা গাছের সারিতে ঢাকা রাস্তার মোড় পর্যন্ত যতদূর চোখ যায়, ততদূর পর্যন্ত তাকিয়ে ডাকপিয়নের অপেক্ষায় বারান্দায় পায়চারি করা ছাড়া অন্য কিছুই এই দিনটিতে মনদিয়ে করতে ইচ্ছে করেনা। ডাকবিভাগের বিশেষ উদ্বোধনী খামে নতুন নতুন ডাক টিকেটে লাগানো প্রতিটি খামের ভেতরে, গাঢ় নীল রঙের কাগজে লেখা প্রতিটি চিঠি 'প্রিয়তমা' সম্বোধনে লেখা হলেও এগুলো আমার কাছে নেহাৎ প্রেমপত্র নয়। ফার্সি কবি গালিব কিংবা মীরের মত এই চিঠিতে লেখা কবিতা গুলোও আমাকে এলোমেলো করে দেয়। চিঠির প্রতিটি শব্দ, উপমা আমার কাছে ধনরত্নের মত; কারুকার্যময় গহনা কিংবা মসলিন শাড়ীর চাকচিক্য এ সজ্জার কাছে অত্যন্ত মলিন। মাঝে মাঝে অবাক হই এই ভেবে যে চিঠির প্রেরকের চেয়ে চিঠিগুলোই যেন আমার বেশী আপন, ওদের সঙ্গেই যেন আমার বেশী ঘনিষ্ঠতা। আর তাই হয়তো, এমন রোমান্টিক দিনে তার সাথে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করছে না বরং তার চিঠির জন্য অপেক্ষা করতেই ভালো লাগছে। চিঠির লেখকতো আর সব সাধারন মানুষের মতই ভালোবাসা, হিংসা, রাগ, ক্রোধ নিয়ে গড়া একজন সাধারন মানুষ। কিন্তু তার লেখাগুলো আসাধারন! শুধুই আমার জন্য। তার প্রতিটি চিঠিই যেন একজন নিঃসঙ্গ মানুষের প্রচ্ছন্ন পোট্রেট, যা তার নিজের ভাষায় লেখা; মনের সবটুকু আবেগের আঁচড়ে কোন রংতুলির ব্যবহার ছাড়াই অত্যন্ত জীবন্ত। যদি কখনো মনে হয়, এই চিঠি পাওয়ার দিনগুলো একসময় ফুরিয়ে যাবে, সব না বলা কথা গুলো বলা হয়ে যাবে, সব প্রতিক্ষার অবসান হবে, তখন আমি শিউরে উঠি! কেমন করে কাটবে বর্ষার অন্ধকার রাত্রিগুলো? আমার চোখ যে তারা গুনতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সন্ধার আবছা আলোতে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বুধবারের চিঠির লাইন গুলো না পড়ে সাপ্তাহের বাকী দিনগুলো কিভাবে কাটাবো? দেখতে দেখতে আমার একান্ত নিজস্ব ড্রয়ারে কত চিঠিই না জমে গেল!

যাদুঘরের দেয়ালে ঝোলানো বিভিন্ন শিল্পীর ছবি দেখতে দেখতে ভাবছি - তুলিতে মনের মত রং মিশিয়ে যারা ছবি আঁকে, কিংবা পাথর খোদাই করে ভাস্কর্য গড়ে, তাদের ঐসব শিল্পের মত চিঠি লেখাটাও কি কোন

শিল্পের পর্যায়ে পড়ে? হয়তো পড়ে না। কিন্তু তবু আমার দীর্ঘদিনের সখ, কোন একদিন আমার নিজের একটা ছোট্ট কাঠের তৈরী বাংলো বাড়ী হবে। বাড়ীর চারপাশটা হবে খুবই নির্জন। বাড়ীর সামনে শান্ত একটা পুকুর। পুকুর পাড় ঘিরে থাকবে দোলন চাপার সারি। বাড়ীর পেছনে ঘন বাঁশবন। কাঠের বাড়ীর দোতালায় একটা আলো আধারি ঘর থাকবে। সেই ঘরের জানালার পর্দা উড়িয়ে দিনরাত খেলা করবে বাতাস। যদিও ঐ ঘরে জানালার পাশেই যে মহুয়া গাছটা থাকবে, তার ফুলের গন্ধে বাতাস ভরে থাকে, তবু ঐ ঘরে সন্ধ্যা বেলা জ্বলবে অনেকগুলো সুগন্ধি মোমবাতি। সেই ঘরেই থাকবে আমার সবগুলো চিঠি এলোমেলো ভাবে সাজানো, সেই ঘরটা হবে আমার আপন যাদুঘর। হয়তো ঐ যাদুঘর কেউ কোনদিন দর্শন করবেনা। তাতে ক্ষতি নেই।

আমার চিঠির যাদুঘর সাজানোর জন্য অনেকদিন ধরে আমি কতগুলো বাঁশের বাঁশিও সংগ্রহ করেছি। যখনই কোন বইমেলা বা বৈশাখী মেলায় যাই, শত মানুষ আর স্টলের ভিড়ে আমি একজন বাঁশিওয়ালাকে খুজে বের করার চেষ্টা করি। জনান্তীকে কোন একটা গাছের নীচে বসে সে আপন মনে বাঁশি বাজায়, তার নিজের হাতে বাঁশ পুড়িয়ে বানানো বাঁশির পশরা নিয়ে। তার পোশাকে আর চেহারায় দারিদ্রের মলিন ছাপ সুস্পষ্ট হলেও বাশির করুন গেয়ো সুর আমাকে আকর্ষন করে। প্রতিটি বাঁশির সাথে ছোট্ট গোলাকার স্টিকারে লেখা থাকে ‘লাবু মিয়ার বাঁশি’।

মিউজিয়ামের নীচতলা, দোতালা, তিন তলা ঘুরছি। ঘড়িতে সময় দেখিনি তবে আমার ইনটুইশন বলছে এখন ক্যাম্পাসে ফিরে যাবার সময় হয়ে গেছে। বাইরে ততক্ষনে ঝমঝমে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ভীষণ ইচ্ছে করছে রিক্সার হুড ফেলে উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে বৃষ্টিতে কাক ভেজা হয়ে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু এই সামান্য ইচ্ছে টুকু এই মুহুর্তে পূরন করার সাধ্য নেই! যাদুঘরের গেটের সামনে কিছুক্ষন দাড়িয়ে থেকে একটা রিক্সা পেয়েছি। রিক্সাওয়ালাকে অনুরোধ করলাম আমাকে বুয়েট ক্যাম্পাসে নিয়ে যেতে তবে যাবার সময় যেন কার্জন হলের সামনে দিয়ে ঘুরে যায়। রিক্সা দিয়ে যেতে যেতে পর্দার ফাঁক দিয়ে কার্জন হলটাকে আরেকবার দেখবো। প্রিয় জায়গার কাছাকাছি যাবার এই লোভটুকু সামলাতে পারছি না।

অবশেষে রিক্সা এসে থামলো বুয়েটের ই.এম.ই. ভরনের সামনে। বোঝা যাচ্ছে মাত্র ক্লাস শেষ হয়েছে। সবাই একতলায় এসে ভীড় করেছে। অপেক্ষা করছে রিক্সার জন্য। আমি রিক্সা থেকে নামার আগেই কয়েকজন ছাত্র রিক্সাওয়ালাকে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। আমি রিক্সাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে, প্লাস্টিকের পর্দা সরিয়ে একগাদা কদমফুলের গোছা হাতে নিয়ে রিক্সা থেকে নামলাম। অনেকেই আমার ফুলগুলোর দিকে বিস্ময় সূচক চিহ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে। আমি নিজেও কিছুটা। আস্তে আস্তে আমিও ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলাম। বন্ধুদের সাথে গুঞ্জনে যোগ দিলাম। মার জন্য অপেক্ষা করছি। দূর থেকে আমাদের গাড়ী আসতে দেখে ধীরে ধীরে ভীড় ঠেলে শেডের নীচে এসে দাঁড়ালাম। ড্রাইভার কাকু গাড়ী থামাতেই দৌড়ে গাড়ীতে উঠলাম, ভাবখানা এমন যেন এক ফোটা বৃষ্টিও গায়ে না লাগে। গাড়ীতে ঢুকতেই শীতে কেঁপে উঠলাম। বৃষ্টি ভেজা কদমফুল গুলো আর ব্যাগ ধরিয়ে দিলাম মার হাতে। খুশিতে ভরে উঠলো মার মুখ। একটুও দেরী না করে মা শুরু করলো রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি। আমি আস্তে আস্তে ব্যাগ থেকে বের করতে লাগলাম বেলীফুলের মালাগুলো। মুহুর্তেই বেলীফুলের গন্ধে গাড়ীর ভেতরটা ভরে গেল। মনে মনে মাকে ফাঁকি দেয়ার জন্য মিথ্যে উত্তর তৈরী করছি। বেলী ফুলের সব গুলো মালা একে একে মাকে পরিয়ে দিলাম।

এসির ঠান্ডা বাতাসে, বেলীফুলগুলো যেন আরো গন্ধ ঢেলে দিয়েছে, সারা গাড়ী বেলীফুলের গন্ধে মৌ মৌ করছে। মা আপন মনে একের পর এক কবিতা আবৃত্তি করছে, আমাকে কোন প্রশ্ন না করে। আমি জানালা দিয়ে দেখছি বৃষ্টি ভেজা চলমান ঢাকা আর ভাবছি কখন ডাকপিয়ন আসবে আমার নীল চিঠি নিয়ে?